শ্রীরামকৃষ্ণসূত্র

অজয় কুমার ভট্টাচার্য

ঈশ্বরের ইতি করাটা হীনবুদ্ধি

ইতি করা মানে শেষ করা। এই দ্বন্দ্বমূলক জগতে নিরন্তর শুরু আর শেষের খেলা চলে। যার শুরু আছে তারই শেষ আছে। আমাদের প্রত্যক্ষে এমন কিছু নেই যার শেষ নেই। কিন্তু মজা হচ্ছে, এই শেষ হওয়া নিয়ে আমাদের আপত্তি আছে। যা অনভিপ্রেত তার শেষ হোক, কিন্তু অভিপ্রেত কোনও কিছুরই যেন শেষ না হয়। আমাদের মনে এই অশেষের ছোঁয়া আছে কোথাও, তাই আমাদের অমর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা চিরকাল। চোখের সামনে এই জন্মমরণশীল জগতের পেছনে কোনও সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের মেনে নিতেই হয়। বিজ্ঞান বলে এ-সৃষ্টি হঠাৎ একটা ব্যতিক্রম, এর পেছনে কোনও চৈতন্যশক্তির সুনিশ্চিত অবদান আছে কী না তা প্রমাণ করা যায় না, তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়। আবার যাঁরা চৈতন্যময়ী সৃষ্টিশক্তিকে মানেন তাঁরাও শাস্ত্র ও মহাপুরুষের দিব্য অনুভবে বিশ্বাস করার বাইরে কিছু দেখাতে পারেন না। আমরা যেহেতু শাস্ত্র ও মহাপুরুষের অনুভবকে মানার দলে, তাই আমরা জগতের পেছনে জগৎকারণকে দেখি। তবে তাঁকে মরণশীল ভাবলে এই সৃষ্টির প্রবাহ চলে না। যদি এমন হয় যে তাঁর মৃত্যুতে এই প্রবাহ থেমে যায়, তাহলে আবার প্রশ্ন ওঠে যে, তাঁকে সৃষ্টি কে করল। যিনি তাঁকে সৃষ্টি করলেন তিনিও যদি মরণশীল হন তাহলে ওই একই প্রশ্ন আবার উঠবে। এই অনবস্থা দোষ কাটাতে আমাদের অশেষ কিছুর কল্পনা করতেই হয়—যাঁর শুরু নেই, তাই শেষও নেই। পুরাণে আছে, অনন্তশায়ী নারায়ণ অনন্ত কারণসমুদ্রে অনন্তনাগের বিস্তৃত ফণার নিচে যোগনিদ্রায় অভিভূত। আমাদের মন যাতে ধরতে পারে সেইরকম একটি অনন্তভাবনার রূপ পুরাণ তুলে ধরেছেন। এইবার নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে অযোনিসম্ভূত ব্রহ্মার আবির্ভাব ঘটল। সেই অনন্ত সত্তার জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা পূর্ণ করতে ব্রহ্মার আবির্ভাব।

ব্রহ্মা অযোনিসম্ভূত হলেও যেহেতু তাঁর আবির্ভাব হল তাই তাঁর তিরোভাবও ঘটবে এটাই যুক্তিসিদ্ধ। শুধু আমাদের সময়ভাবনার সঙ্গে তাঁর সময়ভাবনার তফাত অনেক। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চারযুগের যে-মানবীয় কালের ধারণা, অর্থাৎ—৬৪+৩২+১৬+৮=১২০ লক্ষ বছর, সেই কালের চতুর্গুণ হল ব্রহ্মার একদিন ও সমপরিমাণ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক

সময় তাঁর একরাত্রি। সেই হিসাবে বছর গুণে তাঁর আয়ু একশো বছর। তাঁর দিনমানে এই জগৎ ব্যক্ত হয় আবার তাঁর রাত্রিতে তা অব্যক্তে ফিরে যায়। তাঁর তিরোভাব হলে মহাপ্রলয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তখন মা সৃষ্টির বীজগুলি কুড়িয়ে রেখে দেন। সেই সৃষ্টির বীজ থেকে—''সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ'' (সৃষ্টিসূক্ত ৩)—সূর্য-চন্দ্র সমন্বিত এই জগৎ তিনি পূর্ব পূর্ব কল্পের সূর্য ও চন্দ্রের মতো—আবার নয় শুধু, বারবার সৃষ্টি করেন। এ-বিষয়ে স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজী একটি কৌতুককর কথা বলেন। এক ভক্ত তপস্যা করে ব্রহ্মাকে পেলেন। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি কী বর চাও?'' ভক্তটি বললেন, ''বেশি কিছু নয় প্রভু, আপনার কাছ থেকে একটি পয়সা চাইছি, যা এই পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা।'' ব্রহ্মা বললেন, ''বেশ তাই পাবে, তবে আমার এক মিনিট পর।'' কথাটি মজার হলেও, এই পার্থিব জগতে আমাদের পরিমাণ ও সংখ্যার তুচ্ছতা যে এ-বিশ্বের নিরিখে কতখানি তার একটা আভাস আসে। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ব্রহ্মার আবির্ভাব, আর তাঁর পিছনে সেই অনন্তরূপী নারায়ণ যাঁর আদি নেই অন্তও নেই। ''উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'' (শ্রীরামরহস্য, ৭)—নিরাকার অনন্তের চিন্তা করার যোগ্যতা খুব কম মানুষের হয়, তাই সাধকের সুবিধার জন্য ব্রহ্মের বিভিন্ন দেবতার রূপ পরিগ্রহ। গীতায় আছে, ''অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে'' (১২/৫)—দেহবোধ থাকতে অব্যক্তের চিন্তা করা দুঃসাধ্য। তাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্যে সেই অব্যক্ত তত্ত্বের রূপ চাই। এজন্যই শক্তির অবতারণা, এজন্যই দেবদেবীর নানা রূপ ও অবতাররূপে শক্তির অবতরণ। এই ব্যক্ত রূপটি ওই অব্যক্তের যোগসূত্র। ''রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি।''

এখানেই আবার সমস্যার শুরু। সৃষ্টিবৈচিত্র্যে মানুষের ভাবের বিভিন্নতা অনন্ত, তাই তাদের কল্পনায় সেই অব্যক্তের ব্যক্তরূপও অনন্ত। আধ্যাত্মিকতার উন্মেষের প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কত রূপের আবির্ভাব হয়েছে, এখনও হয়ে চলেছে। তার মধ্যে কত আবার বিলীনও হয়ে গেছে আর নতুন নতুন ভাবরূপের আবির্ভাব হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হয় তখনই যখন সৃষ্টিতে আমাদের বিভিন্নতার ফলে যে-ভেদবুদ্ধি আছে তা আমাদের পূজিত ঈশ্বরের রূপেও এসে পড়ে। যখন মনে হয় আমার পূজিত রূপটিই শ্রেষ্ঠ ও মুক্তি দেওয়ার অধিকারী, অন্য সব রূপগুলি বৃথা বা আমার এই পূজিত রূপে পৌঁছে দেওয়ার উপায় মাত্র, তখনই উঁচুনিচু ভেদবুদ্ধি এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব ও দ্বেষবুদ্ধির শুরু। এই প্রসঙ্গে একটা কথা এসে পড়ে। অদ্বৈতপন্থীরা অধ্যাত্মসমাজে নিজেদের ব্রাহ্মণ ভাবেন, দ্বৈতী ও বিশিষ্টাদ্বৈতীদের চেয়ে। লীলাপ্রসঙ্গকার সারদানন্দজী লিখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে, অদ্বৈতভাব এ-পথের শেষকথা। আবার লিখেছেন, অদ্বৈতপথের সাধনায় এই দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতভাব পরপর এসে উপস্থিত হয়। তাতে মনে হতে পারে বাকি দুটি অদ্বৈতপথের সোপান মাত্র। পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজীর কাছে এর ব্যাখ্যা চাইলে তিনি বলেছিলেন, অদ্বৈতবোধের কোনও বাচিক প্রকাশ নেই তাই শেষকথা মানে সেখানে কথার শেষ। তিনি এর উচ্চনীচ বা ক্রমউত্তরণ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। যাঁরা অদ্বৈতপথের সাধক তাঁদের জীবনে এগুলি পরপর আসতে পারে, কিন্তু যাঁরা রূপের প্রতি ভালবাসায় রূপের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান অথবা যাঁরা সর্বভূতে সেই নিত্যের উপস্থিতি আস্বাদন করতে চান, তাঁদের সিদ্ধির আনন্দসম্ভোগের পরিমাপ কি করা সম্ভব! সত্যিই তো, সৎ-চিৎ-আনন্দের সতের সত্তায় ডুবে যাওয়ার আনন্দ আর তার চিৎ বা চৈতন্যের প্রকাশ অনুভবের আনন্দ কি কম-বেশি হতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণ না

এলে অধ্যাত্মসমাজের এই জাতিভেদ দূর হত না। তিনি বলেছেন, ''যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা'', উপমা দিয়েছেন জ্ঞান ও ভক্তির একত্বের। সেই নিত্যই ভক্তিহিমে বরফ হয়ে রূপ ধারণ করে, আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে গলে গিয়ে যেমন জল তেমন জল। আরও বলেছেন, কোনও কোনও জায়গায় বরফ আছে যা কখনও গলে না, বিজ্ঞানীরা যাকে 'perpetual snow' বলেন। তিনি ভক্তের চোখে নিত্যরাধা, নিত্যকৃষ্ণের চিরন্তন রূপের কথা বলেছেন। নিত্যের আনন্দ ও লীলার আনন্দের ভেদ বুঝবে কে? শ্রীরামকৃষ্ণের এই দুই পথেই নিরন্তর আসা-যাওয়া, তাই তাঁর কথাই এযুগের বেদবাক্য। যে-অদ্বিতীয় সত্তার বিভিন্ন রূপের উপাসনার মাধ্যমে আমাদের একত্ববোধ দৃঢ় হওয়ার কথা তা ভেদবুদ্ধি ও বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বর যে অনন্ত, তাঁর ভাব ও রূপও যে অনন্ত সেই শাস্ত্রবাক্য ভুলে আধ্যাত্মিক উন্নতির বদলে ঈর্ষা, দ্বেষ ও দ্বন্দ্বের জালে জড়িয়ে পড়ে মানুষ।

''তোর পথ ঢাইকাছে মন্দিরে মসজিদে—
ডুইবা যাতে অঙ্গ জুড়ায়
তাইতে যদি জগৎ পুড়ায়,
বল গো গুরু কোথায় দাঁড়াই!
তোর অভেদ সাধন মরল ভেদে
তোর দুয়ারে নানান তালা—
কোরান পুরাণ তসবিমালা
ভেদপথই তো প্রধান জ্বালা,
কাইন্দে মদন মরে খেদে।'' (মদন বাউল)

এই দ্বেষ, বিভেদ যখন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকেই ঢেকে ফেলে তখনই সেই শক্তির অবতরণ ঘটে আমাদের মধ্যে। সেই শক্তির নবতম প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ''ঈশ্বরীয় ভাবের ইতি করতে নেই। তিনি এই হতে পারেন আর এই হতে পারেন না এরকম ভাবতে নেই। আমি জেনে রেখেছি তিনি সবই হতে পারেন, তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই।'' সমন্বয়ের বাণী এত সোজা করে আর কেউ বলেননি। যে যেভাবে তাঁকে ডাকছে সবই সত্য, কারণ ঈশ্বরীয় ভাবের ইতি হয় না, তাই তা করতে নেই।

ঈশ্বর কল্পতরু

কল্পতরু বা কল্পবৃক্ষ একটি কল্পিত বৃক্ষ, যা স্বর্গের বস্তু। এই বৃক্ষের কাছে যে যা চায় সে তাই পায়। আমাদের অপূরণীয় ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে এই বৃক্ষের কল্পনা। কিন্তু আমরা কী ভোগ করব তা-ই আমাদের অজানা। আমাদের মন যা চায় তাই আমরা আমাদের চাওয়া বলে জানি, ফলে এই অনিয়ন্ত্রিত মনের নিরন্তর আশা-আকাঙ্ক্ষার জালে জড়িয়ে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে থাকে। তখন আমরা যা চাওয়া উচিত ছিল বলে মনে করি তা আর আমাদের হাতে থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাণ্ডারে এই কল্পতরু নিয়ে মজার কিন্তু অতি শিক্ষণীয় একটি গল্প আছে। এক পথিক অনেক পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে এক গাছের নিচে বসেছে। গাছপালার মধ্য দিয়ে ক্লান্তিজুড়ানো মাঠের হাওয়ায় তার খিদে পেতে লাগল। মনে হল, আহা, এই সময় যদি গরম খাবার পাওয়া যেত তাহলে কী ভালই হত! এখন সেই গাছটি ছিল কল্পতরু। অতএব সঙ্গে সঙ্গে গরম উপাদেয় খাবার হাজির। পথিক অবাক হলেও পেটভরে খেয়ে নিল। খাওয়ার অব্যবহিত অনুষঙ্গ ঘুম। তাই আবার ভাবল, যদি একটা বিছানা পাওয়া যেত তাহলে এক ঘুম লাগিয়ে তারপর আবার হাঁটা যেত। চিন্তামাত্রই সুন্দর বিছানা হাজির। আরাম করে শুয়ে ভাবল যে, যদি কোমল হাতের পদসেবা পাওয়া যায় তাহলে ঘুমটি আরও আনন্দের হয়। সব যেমন আসছে, সেরকমই এক সুন্দরী নারীর আবির্ভাব ও পদসেবা শুরু হল। পথিক সেবা নিতে নিতে ভাবল—যা ভাবছি তাই আসছে, কী জানি বাবা, চারপাশে যা গাছপালা তাতে বাঘ না বেরিয়ে

পড়ে। মুহূর্তে বাঘ বেরিয়ে তাকে খেয়ে ফেলল।

ঠাকুর গল্পটি বলে বললেন, চাইতে চাইতে বাঘ বেরিয়ে পড়ে। নীতিবাক্য এটিই যে, মনের ওপর নির্ভর করে চাওয়ার শেষে দুর্ভোগ। প্রাপ্তির ঝুলিতে বাঘের আবির্ভাব ঘটে।

তাই ঠাকুর ঈশ্বরকে বললেন কল্পতরু। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি নিতেও পারেন আবার দিতেও পারেন। আমাদের ভোগাকাঙ্ক্ষাকে সনাতন ধর্ম উড়িয়ে দেননি। বরং সেই আকাঙ্ক্ষাকে চারভাগে ভাগ করে সেই ক্রমে আমাদের জীবনের লক্ষ্যকে তুলে ধরেছেন—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। যেহেতু মানবজীবনের লক্ষ্য মোক্ষ তাই তার আগে তিনটি পর্ব শাস্ত্র স্বীকার করেছেন। তার প্রথমেই ধর্ম, আর সে-ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়, সেটি হল মানবধর্ম। এটি একটি লক্ষণ যা মানুষকে বাকি সব জীবের থেকে আলাদা করে রেখেছে। সেই লক্ষণটি হল ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা, যার অপর নাম বিবেক। এই বৃত্তিটির উৎকর্ষ সাধনে মানব অতিমানবে রূপান্তরিত হতে পারে আবার এর অপকর্ষ সাধনে মানুষ পশুপর্যায়ে নেমে যেতে পারে। মানুষ মননশীল বলেই মানুষ, তাই তার উৎকর্ষ সাধনই মানবধর্মের লক্ষ্য। সে-লক্ষ্যে স্থির থেকে উপার্জন এবং নিয়ন্ত্রিত কামনার পূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ‘‘ভোগান্ত না হলে ঈশ্বরে মন হয় না।’’ এই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে ভোগান্তের নিরলস প্রয়াস চালাতে হবে। এই প্রয়াস জারি রাখার জন্যই সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ওই চারটি পর্যায়ের উপযোগী করে। সেগুলি হল—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। তার মধ্যে প্রথমটি ওই মানবধর্ম লাভের ভিত্তি, যেটি গুরুগৃহে তৈরি হত। গাহর্স্থ্যজীবনে অর্থ ও কাম। বানপ্রস্থে ভোগান্তের সাধনা ও সন্ন্যাসে সর্বত্যাগ করে মুক্তির পথে এগিয়ে পড়া।

কিন্তু এখানে ঈশ্বরের কল্পতরুত্ব কোথায়? আসলে শাস্ত্র যা বলেছেন তা অনুসরণ করতে অতুল শক্তির দরকার। সংসারের অর্থাৎ ভোগের আকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের চেয়ে কম নয়। মাধ্যাকর্ষণ যেমন সবকিছুকে টেনে নিচে নামিয়ে দেয়, এই জগতের আকর্ষণ তেমনি প্রচণ্ড শক্তিবলে আমাদের নামিয়ে তাতে লিপ্ত করে ফেলে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—‘‘জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।/ বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥’’ ভোগের কুফল সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান হয়েছে, তাদেরও মহামায়া জোর করে মোহগ্রস্ত করে রাখেন। ভোগান্তের ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ছোট ছোট কামনাগুলি পূরণ করে নিতে আর বড়গুলি বিচার করে ত্যাগ করতে। তাঁর একদিন পেঁয়াজ খেতে ইচ্ছা হল, পেঁয়াজ মুখে নিয়ে একবার এদিক আবার ওদিক করে ফেলে দিলেন, আর মনে ওঠেনি। কিন্তু আমাদের তা হওয়া দুষ্কর, মনে তা উঠতেই থাকবে। এ যেন এক অন্ধকার বিশাল ঘরের বহু উঁচুতে একটি ছোট আলোর জানালা, আর সেখানে পৌঁছতে এক ঢালু পথ আছে। সেই দুঃসাধ্য পথে চলতে পরিশ্রম ও চেষ্টায় প্রতিনিয়ত পতন হতাশা এনে দেবে। এখানেই প্রয়োজন ঈশ্বরের। মহামায়া, যিনি এই সংসারের আকর্ষণে এত শক্তি দিয়েছেন তিনিই এই আকর্ষণ কমিয়ে দিতে পারেন, চাই কি একদম মুক্ত করেও দিতে পারেন। এর জন্য চাই নিরলস প্রার্থনা, ‘‘মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ কোরো না।’’

কিন্তু ঠাকুর বলছেন তাঁর কাছে গিয়ে চাইতে হয়। কাছে যাওয়া মানে ভালবাসা; ভালবাসাই মানুষকে কাছাকাছি আনে, আর দ্বেষ মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই তাঁর সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতানো, যে-সম্পর্ক দিয়ে ভালবাসা যায়। ঈশ্বর কল্পতরু, তিনি আমাদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যা চাই তাই দিতে পারেন এবং দেন। এই প্রসঙ্গে আসে যে, ঠাকুরের ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি নির্বিচারে সকলকে চৈতন্যপ্রদানের ঘটনাকে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র

দত্ত ঠাকুরের কল্পতরু হওয়া বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সারদানন্দজী এই ঘটনাকে 'আত্মপ্রকাশে অভয়দান' বলে উল্লেখ করেছেন। মনে যা ওঠে কল্পতরু তাই দান করে, কিন্তু ঠাকুর তা করেন না। অধর সেন ডেপুটি, সেযুগে তিনশো টাকা মাইনে পেতেন, তিনি একহাজার টাকা মাইনের এক চাকরির জন্য দরখাস্ত করে ঠাকুরকে ধরে বসেছিলেন যাতে চাকরিটা হয়। ঠাকুর দুঃখিত হয়ে মা ভবতারিণীকে বলেছিলেন, ''মা, তোমার কাছে জ্ঞান, ভক্তি না চেয়ে এই সব চাইছে, যদি হয় তো হোক।'' তবে মা তা করে দেননি। যে-পথে ভোগাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির নিশ্চিত সম্ভাবনা তা ঠাকুর অনুমোদন করেননি। তাঁর কাছে অনেক ভক্ত গভীর স্নেহ পেয়েও পরে দূরে সরে গিয়েছিল। সেটিও তাদেরই কল্যাণের জন্য।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, ''রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা/ রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।/ ত্বামাশ্রিতাং ন বিপন্নরাণাং/ ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রযান্তি॥''— তিনি সন্তুষ্ট হলে আমাদের ভবরোগ দূর করে দেন, আর রুষ্ট হলে আমাদের অভীষ্ট কেড়ে নেন। তাঁকে আশ্রয় করলে মানুষের বিপদ হয় না, আবার তাঁকে আশ্রয়-করা মানুষ অনেকের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠেন। তিনি সকলের মা, সকলের ধাত্রী, তিনি জানেন কোনটিতে আমাদের কল্যাণ এবং তাই দেন, অতএব যা আমাদের তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে সে-বস্তু তিনি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেন। মা যেমন শিশুসন্তানকে কুপথ্য খেতে চাইলেও দেন না, পাছে তার শরীর খারাপ হয় এবং লুকিয়ে খাচ্ছে দেখলে তার হাত থেকে তা কেড়ে নেন। ঈশ্বর সেই অর্থেই কল্পতরু, যে-তরুর ফল শেষপর্যন্ত পরমার্থই প্রদান করে। *ক্রমশ*

লেখকের প্রতি

* লেখা পাঠাতে হবে ই-মেলে (nibodhatapatrika@gmail.com), pdf করে। ডাকে অথবা হাতে দিলে লেখার একটি নকল অবশ্যই নিজের কাছে রাখুন।
* লেখার সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরের উল্লেখ অবশ্যই করুন।
* আগে কোথাও ছাপা হয়েছে এমন লেখা পাঠাবেন না।
* শুধু ধর্মীয় প্রসঙ্গ নয়—দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, স্বাস্থ্য, বরেণ্য সাধক ও মহাপুরুষদের কথা নিয়ে ইতিবাচক লেখা আমরা প্রকাশ করি। প্রবন্ধ ১৫০০ থেকে ২৫০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্যের জন্য তথ্যসূত্র অবশ্যই দিতে হবে। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ক্রম অনুসরণ করুন : লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশনা সংস্থার নাম, প্রকাশের স্থান ও বর্ষ, খণ্ড বা ভাগ (যদি থাকে) এবং পৃষ্ঠা।

গ্রাহকের প্রতি

* মে মাস থেকে পত্রিকাবর্ষ আরম্ভ হয়। পত্রিকার ফ্ল্যাপে গ্রাহক মেয়াদের উল্লেখ থাকে। যেসব গ্রাহক এখনও নবীকরণ করেননি তাঁদেরকে অবিলম্বে নবীকরণের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য পৃঃ ৯০ দেখুন।
* পত্রিকার কার্যালয় দপ্তরের সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে। দপ্তর কাছেই একটি ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। যেসব গ্রাহক হাতে পত্রিকা নেন তাঁরা সেখান থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করুন।